কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৬ জুলাই, ২০১৮ ২৩:২৮

বৈষম্যমূলক আয় বৃদ্ধির সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আবু তাহের খান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুবাদে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে (জনপ্রিয় আলোচনায় যা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ) রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বহুল আলোচিত একটি প্রসঙ্গ। এ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন এক হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ ৩৬ হাজার ৮৫০, মাসপ্রতি ১১ হাজার ৪০৪ টাকা। অবশ্য এসবই গড় হিসাব, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দেশের শীর্ষ উপার্জনকারীদের মাথাপিছু আয়। আর আয়কর বিভাগের কাছে পেশকৃত রিটার্নে উল্লিখিত আয়ের পরিমাণই তাদের প্রকৃত আয় কি না সেটাও আমরা নিশ্চিত নই। তবে নিম্নবিত্ত শ্রেণির বহু মানুষের আয় সম্পর্কেই আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী কৃষির পরে দেশের বৃহত্তম শ্রম খাত তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি হচ্ছে পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা, যদিও বহু শ্রমিক বাস্তবে এর চেয়েও অনেক কম পান। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এক হাজার ৬৫৬ টাকা; আর এই শ্রমিকদের মধ্যকার ‘বি’ ও ‘সি’ শ্রেণির অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি আরো কম এবং তাদের সংখ্যাই বেশি। প্রায় একই অবস্থা মোটামুটি অন্যান্য খাতেও। পোশাক কর্মী বা চা শ্রমিকের কথা পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য এখানে উদাহরণ হিসেবে আনা হলো মাত্র।

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের চেয়ে অনেক কম। আর এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যে ধারা, সেটিও জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৫৮৫ মার্কিন ডলার এবং একই সময়ে পোশাক খাতের শ্রমিকদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ছিল ৩৮ মার্কিন ডলার। এক দশকের ব্যবধানে জনগণের মাথাপিছু গড় আয় প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেলেও পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে দ্বিগুণেরও কম। অন্যান্য খাতে শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির হার আরো কম। শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মোটামুটি একই রূপ।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির এ শ্রুতিতৃপ্ত অঙ্ক তাহলে কী অর্থ বহন করছে? স্পষ্টতই তা এ বাস্তবতাকেই নির্দেশ করছে যে আয় বৃদ্ধির এ ঘটনাটি ঘটেছে মূলত উচ্চ আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে, যারা সংখ্যায় খুবই সীমিত। কিন্তু সংখ্যায় সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের আয়ের স্ফীতি এতটাই বিশাল যে এই সীমিতসংখ্যকের আয়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্ন আয়ের মানুষের আয় গড় করার পরও তা মধ্যম আয়ের দেশের স্তরে পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে এ তথ্য সম্পদের দুই বিপরীতমুখী মেরুকরণকেও নির্দেশ করছে বৈকি, যার আওতায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের আয় বৃদ্ধির মন্থরগতির বিপরীতে বিত্তবান শ্রেণির সম্পদের দ্রুত প্রসার ঘটছে। আর এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সমাজে সম্পদবৈষম্য দিনে দিনে আরো বাড়তেই থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সম্পদের উপরোক্ত মেরুকরণের পেছনে মূলত কাজ করছে একধরনের শ্রম শোষণ।

শ্রম শোষণের প্রসঙ্গ উঠতেই সহজ উদাহরণ হিসেবে আমরা পোশাক খাত নিয়ে আলোচনা করি। অর্থনীতির বৃহত্তম শ্রমঘন খাত হিসেবে পোশাক খাতের মজুরি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, শ্রম শোষণ শুধু পোশাক খাতের নয়, অন্যান্য খাতেও রয়েছে এবং এসবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এর চেয়েও খারাপ। আর এসবের মধ্যে সর্বাধিক মানবেতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে চা বাগান ও চা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, চালকল, রাবারশিল্প, প্লাস্টিক শিল্প ও জাহাজভাঙা শিল্পে। অবাক হওয়ার মতো তথ্য এই যে এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি দুই হাজার টাকারও কম—মাথাপিছু মাসিক জাতীয় গড় আয়ের এক-পঞ্চমাংশেরও নিচে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আয় বৃদ্ধির এ বৈষম্যমূলক ধারা দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

শেষোক্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে প্রথমেই সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ওপর উল্লিখিত বৈষম্যমূলক আয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এর ফলে : ১) অস্বচ্ছ পন্থায় রাতারাতি অর্থ উপার্জনকারীদের মধ্যে যুক্তিহীন, অর্থনৈতিক ও লোকদেখানো ভোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং এর পারিপার্শ্বিক প্রভাবে মধ্য বা নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যেও এরূপ ভোগের প্রবণতা দৃষ্টিকটুভাবে জেঁকে বসেছে, সে ভোগের জন্য তাদের পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও। আর এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্য ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের বিশেষত তরুণদের মধ্যেও পরিশ্রম না করে সংক্ষিপ্ত পন্থায় রাতারাতি বিত্তবান হওয়ার মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যাপকসংখ্যক মানুষের মাদক কারবারে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টিও অনেকাংশে রাতারাতি বিত্তবান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত বৈকি!

এটা এখন সর্বজনবিদিত তথ্য যে পুঁজির একচ্ছত্র শাসনে বেশির ভাগ বিশ্বসম্পদের মালিকানা যেমন মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে, তেমনি এই বাংলাদেশেও অতি স্বল্পসংখ্যক মানুষ রাষ্ট্রের বেশির ভাগ সম্পদকে কুক্ষিগত করে নিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, কুক্ষিগত এই বিশাল সম্পদের একটি বড় অংশই অনৈতিক পন্থায় উপার্জিত। আর অনৈতিক পন্থায় যাঁরা উপার্জন করেন অর্থাৎ ব্যয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা নৈতিক পথ ধরে এগোবেন—এমনটি আশা করা অবান্তর। বাস্তবে তা ঘটছেও না। ফলে নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত পন্থায় সম্পদ আহরণকারীরা সমাজে নতুন করে নানা রকম অনৈতিক অনুষঙ্গের জন্ম দিচ্ছেন এবং এর ফলে সমাজের সামগ্রিক গুণগত মানও দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। সমাজ থেকে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ, প্রতিবাদী সত্তা, নিরাপসকামিতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়ার পেছনে এই নৈতিকতাবর্জিত সম্পদশালীদের যথেচ্ছ জীবনাচরণ বহুলাংশে দায়ী বৈকি!

একসময় সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতেন শিক্ষিত, মেধাবী ও সজ্জনরা। আয় বৃদ্ধির সুবাদে (আয় বৃদ্ধিকে দোষ দেওয়া হচ্ছে না) সে নেতৃত্ব এখন যথেচ্ছ পন্থায় সম্পদ আহরণকারীদের হাতে। জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও গোত্র সর্বত্রই নেতৃত্ব এখন বিত্তবানদের হাতে, তা সে বিত্ত বৈধ বা অবৈধ যেকোনো পন্থায়ই আসুক না কেন। রাজনৈতিক দলগুলোও এখন বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে সম্পদশালীদের কাছে জিম্মি। জাতীয় বা অন্য যেকোনো নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সম্পদশালী হওয়া। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন আইন পরিষদে ব্যবসায়ী সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪ শতাংশ। এখন তা ৬৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে এই ৬৩ শতাংশের অধিকসংখ্যক সদস্য মিলে যখন সংসদে কোনো আইন করেন বা কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা বিত্তহীনদের বা নিম্নবিত্তের পক্ষে যাবে—এমনটি ভাবা সত্যি কঠিন।

সমাজ থেকে আয়বৈষম্য রোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রের আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাকে এমনভাবে সাজানো, যাতে তার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ বাড়তি সুবিধা পায় এবং বিত্তবান তার আয়ের একাংশ রাষ্ট্রকে রাজস্ব বা অন্যবিধ পন্থায় পরিশোধে বাধ্য হয়। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই কি ঘটছে না? সমাজের বিভিন্ন বিত্তশালীগোষ্ঠী বাজেটের আগে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে নিজেদের সব আর্থিক সুবিধা অগ্রিম আদায় করে নেয়, জাতীয় সংসদের বাজেট বক্তৃতা যার আলংকারিক ঘোষণা মাত্র। কিন্তু অসংগঠিত কৃষক, দুর্বল শ্রমিক শ্রেণি, নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ—বাজেটে এদের স্বার্থ তুলে ধরার কেউ নেই। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। বাজার অর্থনীতির কথা বলে কৃষি খাতের ভর্তুকি ক্রমাগত উঠে গেলেও বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থের পাহারাদার রাষ্ট্র নানা খাতে নগদ ভর্তুকি দিয়েই চলেছে এবং কোনো কোনো খাতে ফিবছর আবার তা বাড়ছেও।

আয়বৈষম্য বৃদ্ধির দুর্ভাগ্যজনক যে অর্থনৈতিক প্রবণতা বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, তা থেকে বেরোনো সত্যিই কঠিন। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য, তা থেকে বেরোতে না পারলে সামাজিক ক্লেদ ও অনাচার দিন দিন আরো বাড়বে বৈ কমবে না। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কষ্ট, ক্লেদ, দুর্ভোগ, অনাচারই যদি বাড়ে, তাহলে বর্তমানের নিম্নমধ্যম বা ২০২১ সালের মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন কী অর্থ খুঁজে পাবে?

লেখক : পরিচালক, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮,
বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com